যুগান্তর

সেই ক্যাম্পাস, এই ক্যাম্পাস

প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মুঈদ রহমান

এ সময়ে সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে বিতর্কিত এবং সবচেয়ে আতঙ্কিত শব্দের নাম 'ক্যাম্পাস'। বুয়েটে আবরার হত্যার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভয়ংকর চিত্র এখন অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবরার হত্যাকাণ্ডের পর বেরিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনেক অনাকাক্সিক্ষত, অপ্রত্যাশিত, লোমহর্ষক আর নিন্দনীয় অপরাধের ঘটনা; যা বহুদিন ধরে জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তার আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল। কিন্তু ক্যাম্পাসের অতীত এতটা কলুষিত ছিল না। আমি ছাত্র রাজনীতির কথা বাদ দিলাম, দল-মত নির্বিশেষে একসময় গোটা ছাত্রসমাজের ছিল একটি সোনালি অতীত, অসাধারণ বন্ধন আর সখ্য। সে সময়টা খুব বেশিদিন আগের নয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষাকাল ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ৫ বছর। সে সময়ে ছাত্রদের মাঝে কোনো অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটেনি তা বলা যাবে না। তবে সেসব ঘটনা সামাজিক সম্পর্কের বেলায় কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। সারা বছর ধরে চলত বিভিন্ন সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান আয়োজনেও নতুন নতুন চিন্তার প্রতিফলন দেখা গেছে। যেমন র‌্যাগ ডে'র কথাই বলি। র‌্যাগ ডে'র যদি আভিধানিক অর্থ খুঁজতে যান তাহলে পাবেন- 'A day on which university students do silly things for charity'. কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক কিছুই অভিধান মেনে চলে না। র‌্যাগ ডে-তে কী হতো? শেষবর্ষের শিক্ষার্থীরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে, রং-মশালা মাখিয়ে হই-হুল্লোড় করত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা সংশ্লিষ্টদের সীমা ছাড়িয়ে অন্যদেরও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলত।

আমাদের সময় আমরা (জাবি-১১ ব্যাচ) এ কালচার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। শুধু নাম পরিবর্তন নয়, উৎসবের সংস্কৃতিগত দিকটিও পাল্টে ফেলেছিলাম। উৎসবের নাম র‌্যাগ ডে'র পরিবর্তে রাখা হল 'সমাপনী উৎসব' এবং এর সঙ্গে একটি স্লোগান যুক্ত হয়েছিল- 'স্বদেশের পণ্য, কিনে হও ধন্য'। আজ থেকে ৩৩ বছর আগের কথা। উৎসবের অনুষ্ঠান কেবল র‌্যালি এবং রং-কেলির মধ্যে আটকে ছিল না। সকাল ৯টায় শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য

অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। পরে রক্তদান কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সর্বশেষ সম্মানিত ভিসি মহোদয়ের নিমন্ত্রণে নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সেই উৎসবের পরিসমাপ্তি। কোনো রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না, ছিল না বিভেদ। কী অসাধারণ স্মৃতি! গত তিন যুগেরও বেশি সময়ের বন্ধুত্ব আজও অমলিন, আজও সর্ব অর্থে অটুট রয়েছে।

ক্যাম্পাসগুলোর আজকের অবস্থা দেখলে চোখে জল এসে যায়। একটা খটখটে মড়া ক্যাম্পাস- নেই তাতে সাংস্কৃতিক বর্ষণ, নেই তাতে সুষ্ঠু রাজনীতির প্রতিফলন, কেবলই দলবাজি আর দখলদারি। আমরা যে ক্যাম্পাসে অনাবিল আনন্দে দিন কাটিয়েছি, তার বিপরীতে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ততটাই বীভৎস ক্যাম্পাস উপহার দিয়েছি।

২.

ক্যাম্পাসের আরেকটি নগ্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে- তা হল 'র‍্যাগিং'। আপনি যদি এর আভিধানিক অর্থ খুঁজতে যান তাহলে পাবেন- হই-হুল্লোড় বা গোলমাল; কিন্তু প্রায়োগিক বিবেচনায় আদৌ তা নয়। র‍্যাগিংয়ের প্রকৃত রূপটি হল- 'Ragging involves abuse, humiliation or harassment of new entrants or junior students by the senior students. It often takes a malignant wherein the newcomers maz be subjected to pszchological or phzsical torture.' নবীন শিক্ষার্থীদের এ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করার খবরটি আমরা প্রায় জানতামই না। আবরার হত্যাকাণ্ডের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ক্যাডেট কলেজগুলোয়ও এ ধরনের চর্চার কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও র‍্যাগিং ধারণাটি কোনো নতুন কিছু নয়। ৭ম ও ৮ম শতকের গ্রিক সংস্কৃতিতে এর অন্তর্ভুক্তির কথা জানা যায়।

সে সময়ে ক্রীড়া সমাজের দলকে চাঙা করতে গিয়ে নবাগতদের নাকাল করা হতো। কিন্তু আজকের সভ্যযুগে এটা একটা অপরাধ, যা মানবতার পরিপন্থী এবং আমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি এটি একটি 'বিকৃত বিনোদন'। কারণ যারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়, তারা মানসিক বিষণ্ণতা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, নীতিভ্রষ্টতাসহ নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এমনকি দীর্ঘ সময় ধরে এসব অত্যাচারের শিকার হলে একজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। আর আমরা তো জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগতদের বয়স ১৭-১৮ বছরের বেশি নয়। তাছাড়া আজকের বাংলাদেশে আমরা সন্তানদের যেভাবে বড় করে তুলছি তাতে কোনোভাবেই তারা ওই আঘাত সহ্য করতে পারবে না। তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে যেখানে আবাসন ব্যবস্থা আছে, সেখানে নজরদারি পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে। সরকারকেও এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.

খুন, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, র‍্যাগিং ইত্যাদি যতসব নেতিবাচক দিক আছে তার সম্পূর্ণ দায়টাই পড়েছে ছাত্র রাজনীতির ওপর। অনেকেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত দিচ্ছেন। আবার কেউ ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তার সুস্থ ধারা প্রত্যাশা করছেন। আমি মনে করি, এ নিয়ে সামগ্রিক একটা আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ মুহূর্তে আমি তা আলোচনায় আনব না। ক্যাম্পাসের অবস্থা নিয়ে যেহেতু তুমুল শোরগোল, তাই অন্য সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়াটাও সময়ের দাবি।

ক্যাম্পাসে যে ধারার শিক্ষক রাজনীতি চলছে, তা কি আমাদের প্রত্যাশিত? বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতার বয়স প্রায় ৩০ বছর। এ দীর্ঘ সময়ে শিক্ষক রাজনীতি দেশ, জাতি ও একাডেমিক পরিবেশকে কী এমন দিয়েছে, যা উল্লেখ করার মতো? দলবাজি আর তোষামোদের এক জমজমাট আয়োজন হচ্ছে আজকের শিক্ষক রাজনীতি। নীল-গোলাপি-সাদা তো আছেই, তার সঙ্গে আরও সুনির্দিষ্টভাবে আনুগত্য বোঝাতে গঠন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' এবং 'জিয়া পরিষদ'। এর ফল যা পেয়েছি তা হল, বিএনপির সময় ভিসির দায়িত্ব পেয়েছিলেন জিয়া পরিষদের শিক্ষক আর আজকে বঙ্গবন্ধু পরিষদের লোকজন। ছাত্ররা যতটা না লেজুড়বৃত্তি করে, তার চেয়ে ঢের করে শিক্ষকরা এবং তাদের সমর্থনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসিরা।

কোনো সরকার তার সমর্থককে একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পদে বসাতেই পারেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান চালাবেন প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি অনুসারে, এখানে রাজনীতির কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ভিসিদের সেই মানসিকতার আশঙ্কাজনক ঘাটতি লক্ষ করছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, আমাদের সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আর আমাদের ভিসি ছিলেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। অসামান্য পাণ্ডিত্য, অমায়িক আচরণ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অসম্ভব জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তি! তিনি তো কখনোই এরশাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেননি। তিনি প্রশাসন চালিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন গতিতে। আজ সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি, জিল্লুর রহমান স্যারের সামগ্রিক গুণাবলির তুলনায় বর্তমান কালের যে কোনো ভিসির সার্বিক পরিচিতি অনেকটাই মলিন, অনেকটাই বিবর্ণ। কেননা তোষামোদকারীদের অভিব্যক্তি সবসময়ই অনুজ্জ্বল হয়।

লেজুড়বৃত্তির শিক্ষক রাজনীতির ফলটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন। ক্যাম্পাসগুলোয় বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। মাঠজুড়ে আছেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা। কিন্তু হলে কী হবে, রাজনীতিটা যেহেতু চাওয়া-পাওয়ার, সেহেতু প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা দু'ভাগে বিভক্ত। যারা সুবিধা পেয়েছেন, তারা ভিসি গ্রুপ। আর যারা বঞ্চিত, তারা অ্যান্টি ভিসি গ্রুপ। ভিসি গ্রুপ ভিসির কোনো কাজকেই মন্দ বলে না, আর অ্যান্টি ভিসি গ্রুপ ভিসির কোনো কাজকেই ভালো চোখে দেখে না। ব্যাস, এই হল রাজনীতি, এখানে নীতি-আদর্শের কোনো বিষয় নেই, কেবলই ভাগাভাগির ব্যাপার। এমন

অভিযোগ অহরহই শোনা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য ও মেগা প্রজেক্টগুলোর আর্থিক লেনদেনের সঙ্গেও ভিসি-সমর্থিত শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ছেন। এই হল বাংলাদেশের ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষক রাজনীতি। এ রাজনীতির প্রয়োজন কতখানি তা বিচারের ভার সম্মানিত পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

৪.

বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এখানে সরকারের সরাসরি ‘শুদ্ধি অভিযান’ কার্যকর করার সুযোগ কম। কিন্তু সরকার তার ক্ষমতার পরিধি দিয়ে কিছুটা সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। ’৭৩-এর অধ্যাদেশের বাইরে যে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে তোষামোদকে একমাত্র যোগ্যতা বিবেচনার বিষয়টি পরিহার করতে পারে। গোপালগঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয়ের তোষামোদকারী ভিসির অবস্থা তো আমরা দেখলামই, তার রুচিবোধেও আমরা বিস্মিত! আওয়ামী লীগের মতো একটি সংহত দলের এ মুহূর্তে তোষামোদকারীদের প্রয়োজন নেই, আছে গঠনমূলক সমালোচকদের, যারা সংহতির স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেন, যে কোনো নাগরিকের অধিকার আছে জাতীয় কোনো দলের সমর্থক হওয়ার, এতে দোষের কিছু নেই। আবার একটি দল তার সমর্থককে ভিসির দায়িত্ব দিতে পারে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু একজন ভিসি যখনই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তখন ‘দলবাজি’র পোকাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব মতের, সব পথের সদস্যদের নিয়ে একটি সুষ্ঠু-সুন্দর ক্যাম্পাস তৈরিতে ব্রত হতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ থাকবে, সরকারের পক্ষ থেকেও যেন কোনো অপ্রত্যাশিত চাপ প্রয়োগ করা না হয়। এটি সময়ের দাবি।

মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।